সবার জন্য প্রশিক্ষণ

—ডঃ মোহাম্মাদ আনিসুজ্জামান

প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাঃ

প্রশিক্ষণকে সাধারণতঃ সংকীর্ণ অর্থে এবং শিক্ষাকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ প্রশিক্ষণ হচ্ছে অল্প সময়ে কোন কাজ সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান/দক্ষতা অর্জন ও তার পরপরই উক্ত জ্ঞান/দক্ষতাকে কাজে লাগানোর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নিয়োজিত করা। পক্ষান্তরে—শিক্ষা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডিগ্রী নির্ভর ও ক্ষেত্রবিশেষে জীবনব্যাপী সাধনা। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তিকে তার বর্তমান কাজে আরো একটু বেশী দক্ষ করা। শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধারণতঃ ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মময় জীবনের জন্য উপযোগী করে তুলতে সহায়তা করা। অতএব শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ মূলতঃ একই মুদ্রার এপিঠ—ওপিঠ। পার্থক্য শুধু সময়ের, পদ্ধতির ও গুরুত্বের। শিক্ষার কেন্দ্র মূলতঃ স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়। প্রশিক্ষণের কেন্দ্র সাধারণতঃ বিশেষ ধরণের ইনষ্টিটিউট, একাডেমী, সেন্টার। শিক্ষাকেন্দ্রগুলি নির্দিষ্ট বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর পরীক্ষা পাশের ভিত্তিতে ডিগ্রী প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি নির্দিষ্ট মাস/সপ্তাহ অতিক্রান্ত হওয়ার পর ছোটখাট পরীক্ষা অথবা পরীক্ষা ব্যতিরেকে সার্টিফিকেট/ডিপ্লোমা প্রদান করেন। শিক্ষা মূলতঃ কর্মজীবনে প্রবেশের পূর্বে দেওয়া হয়।

প্রশিক্ষণ কর্মজীবনে প্রবেশ করার পরে এবং কর্মরত অবস্থায় বিভিন্ন সময়ে দেওয়া হয়। সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতেই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সমান্তরালভাবে চলে। শিক্ষা/প্রশিক্ষণ ছাড়া সাধারণতঃ কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হয় না। এ অবস্থার ভিত্তি বোধকরি আধুনিক বিজ্ঞান/ প্রযুক্তির যুগে যে কোন কর্মসম্পাদনে কর্মসংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধের অপরিহার্যতা। বিশ্বব্যাপী এই ব্যবস্থাই চলছে। এর ব্যতিক্রম চোখে পড়ে না।

বাংলাদেশে বর্তমানে সরকারী পর্যায়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উভয় সেবাই প্রদান করা হচ্ছে। প্রথমটি ছাত্র ছাত্রীদের কর্মজীবনের জন্য তৈরী করতে লাগছে। দ্বিতীয়টি সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। সাথে সাথে বেসরকারী খাতেও শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত আছে। তবে বাংলাদেশে বর্তমানে শিক্ষাকেন্দ্রগুলি যে হারে সরকারীকরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে বেসরকারী খাতে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু থাকবে বলে মনে হয় না। এতে সরকারের শিক্ষা/প্রশিক্ষণের

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

দায়-দায়িত্ব আরো বাড়ছে। সরকারের সকল প্রচেষ্টা স্বত্বেও আমরা শিক্ষিতের হার পাচ্ছি বর্তমানে ৩৩%। সরকারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো শতচেষ্টা করেও সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দিতে পারছেন না।

এ প্রসংগে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি)-এর কথা প্রাসংগিকভাবে এসে পড়ে। বিপিএটিসি ও অন্যান্য সরকারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পার্থক্য মূলতঃ চারিত্রিক। বিপিএটিসি প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাকে অর্থাৎ বিসিএস ক্যাডারের সকলকে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ দান করেন। যে দায়িত্ব অন্যান্য প্রশিক্ষন কেন্দ্রের নাই। এ ছাড়াও বিপিএটিসি মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ও উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এই তিনটি প্রধান প্রশিক্ষণ কার্য ছাড়াও বিপিএটিসি মাঠ পর্যায়, স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ও বেসরকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। তবে শেষোক্ত কর্মকর্তাদের সংখ্যা প্রথম তিন শ্রেণীর তুলনায় বেশ কম। মুলতঃ বিপিএটিসি অফিসার পর্যায়ে ও আরপিএটিসি গুলি (বিভাগীয় পর্যায়ে ৪টি আরপিএটিসি) কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দান করে আসছে। ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত পিএটিসি ৬০২৫ জন সরকারী কর্মকর্তা ও আরপিএটিসিগুলি ১৮,৬৪৯ জন সরকারী কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দান করছে। বাংলাদেশে সরকারী কর্মকর্তা ১,১৮,৫১৭ জন ও কর্মচারী ১১,০৭,২৬৭ জন। মোট সংখ্যা ১২,২৫,৭৮৪ জন। অতএব এইভাবে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দিতে বিপিএটিসি/ আরপিএটিসির সময় লাগবে প্রায় ৩০০ বৎসর। তবু শেষ হবে না, কারণ ততদিনে কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা আরও বাড়বে। যেমন বাড়বে জনসংখ্যা ও অন্যান্য সমস্যা এবং তার ফলে সরকারের দায়-দায়িত্ব ও কর্মসূচী। তাই এখন সময় এসেছে প্রশিক্ষণ সম্মন্ধে মৌলিকভাবে চিন্তা করার। সকল সরকারী কর্মকর্তা ও সকল সরকারী কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দিতে হলে বিপিএটিসি/ আরপিএটিসির ভুমিকা কি হওয়া উচিৎ? দ্বিতীয়তঃ, যদি প্রশিক্ষণকে শুধুমাত্র সরকারী কর্মকর্তা/সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে সীমিত না রেখে জনগণের মধ্যে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়া হয় তা হলে দেশের সর্ব্বোচ্চ সরকারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে বিপিএটিসি/ আরপিএটিসির ভূমিকা কি হওয়া উচিত? মূলতঃ এই দুই প্রশ্নের বিভিন্ন দিক এখানে আলোচনা করব।

প্রশিক্ষণ ও বিপিএটিসিঃ

সকল সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ যদি মূলতঃ বিপিএটিসি / আরপিএটিসির দিতে হয় তাহলে বিপিএটিসির বর্তমান লক্ষ্য, পন্থা চরিত্র পাল্টাতে হবে।

অর্থাৎ শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নয়; সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এ জন্য বিপিএটিসির বর্তমান অর্ডিন্যান্স (অর্ডিন্যান্স নং- ২৬/১৯৮৪) মৌলিকভাবে পরিবর্তন করতে হবে। নীতি হিসাবে এটাই কাম্য। কারণ সরকারের জন্য সকল কমকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণই কাম্য হবে। অন্যথায় পক্ষপাতিত্ব অথবা অবহেলার কথা উঠবে। পক্ষান্তরে কোন কোন শ্রেণী প্রশিক্ষিত এবং অধিকাংশ কর্মকর্তা/কর্মচারী অপ্রশিক্ষিত থেকে যাবেন। প্রশিক্ষণ পন্থাও উপযুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ স্বল্প সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী প্রয়োজনের তাগিদে সপ্তাহব্যাপী হতে হবে। এমনিতেই বর্তমানে ফেলে রাখা বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ নয়মাস/ছয়মাসের ক্ষেত্রে এখন দুই মাসে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। সময়সীমা কমে গেলে উৎকর্ষের তারতম্য হতে পারে। এই সমস্যা মোকবিলার জন্য চিন্তাভাবনা করতে হবে। হয়ত শ্রেণীকক্ষ-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কমিয়ে মাঠপর্যায়ে ও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। প্রশিক্ষকদেরও কেন্দ্র থেকে বিকেন্দ্রে, মাঠ-ঘাটে, পথে-প্রান্তরে ক্ষেত-খামারে জনগণের সাথে হাতে-হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে। প্রশাসনের লক্ষ্য যদি জনগণের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা হয়- যা হওয়া উচিৎ- তা হলে জনগণের কাছে থেকে তাঁদের সাথে একযোগে কাজ করে তাঁদের সমস্যা লাঘব করার চেষ্টা করা উচিৎ। সরকারী কর্মকর্তাদের চাকুরী জীবনের শুরুতেই এ ধরনের প্রশিক্ষণ দিতে পারলে পরবর্তী কর্মজীবনে জনবিমুখতা আসতে পারবে না। এ ভাবে প্রশিক্ষণের চরিত্র আমূল রদ-বদল হয়ে যাবে।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ঃ

তা হলে দেখা যাচ্ছে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যকে সামনে রাখলে প্রশিক্ষণের কাজ সঠিক পথে চলতে পারে। আমার বক্তব্য, আমরা প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য থেকে সরে যাচ্ছি। যার ফলে প্রশিক্ষণ বর্তমানে শুধুমাত্র কতগুলি পুস্তক মুখস্ত করা, কতগুলি নিয়মকানুন কণ্ঠস্থ করা এবং ক্ষমতার নামে জনস্বার্থের পরিপন্থী কাজ করায় পর্যবসিত হচ্ছে। জনগণ যথাসময়ে বিচার চাচ্ছেন, বিচার পাচ্ছেন না। কোর্ট- কাচারীতে কেসের পাহাড় জমে উঠেছে। উকিল- মোক্তার, ফড়িয়া-টাউটরা সকল মানুষকে প্রতারিত করছেন। জনগণ সরকারী কর্মকর্তাদের পত্র দিয়ে যথাসময়ে উত্তর পাচ্ছেন না। দেখা করতে গেলে দেখা পাচ্ছেন না। অভিযোগ করলেও কোন কাজ হচ্ছে না। হাসপাতালে ডাক্তার কোন সময় আছেন, কোন সময় নাই। থাকলে ঔষধ নাই। এক্সরে মেশিন আছে অথচ এক্সরে প্লেট/ফিল্ম নাই। জনগণ চিকিৎসা পাচ্ছেন না। সরকারী বীজ, সার, পানি, কীটনাশক

ঔষধ, যন্ত্রপাতি তদারকী/উপদেশ—জনগণের পাওয়ার কথা কিন্তু—কার্যতঃ পাচ্ছেন না। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী অনুদান সরকারী অফিস থেকে সহজ পথে আনতে পাচ্ছেন না। যা পাচ্ছেন, লিখতে হচ্ছে অন্য-রকম। উন্নয়নের অর্থ যথা সময়ে না পাওয়ায় সময়সীমার মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে না। হলেও জেড়াতালি দিতে হচ্ছে। এক কথায় প্রশাসনের মূল লক্ষ্য এই সব সমস্যার তড়িৎ সমাধানে জনগণের পাশে সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ দাঁড়াতে পারছেন না। যদি এই চিত্র মোটামুটিভাবে বস্তুনিষ্ঠ বলে ধরে নেয়া যায়, তা হলে এতদিনের প্রশিক্ষণ কোন কাজে লাগছে?

এ গেল বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের কথা। এবারে আসুন মধ্য-পর্যায়ে প্রশিক্ষণের কথায়। এঁরা ১০/১২ বা তার চেয়ে বেশী বৎসরের অভিজ্ঞ অফিসার। এঁদের প্রশিক্ষণ অত প্রয়োজন না যতটা নতুন চাকুরীপ্রাপ্ত অফিসারদের দরকার। অথচ, মোটামুটি এক ধরনের প্রশিক্ষণ এ পর্যায়েও দেওয়া হচ্ছে। তারপর আসুন উচ্চ পর্যায়ে সিনিয়র অফিসারদের কথায়। এঁরা বেশ, বয়স্ক ও অভিজ্ঞ। চাকুরী জীবনের অপরাহ্নে এদেঁর ঐ একই ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। আমার মনে হয় এঁদের প্রশিক্ষণ না দিয়ে এঁদের প্রশিক্ষক হিসাবে নবীন প্রশিক্ষণার্থীদের সামনে হাজির করা দরকার। এঁরা তাঁদের অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরে নবীনদের উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। অথচ প্রশিক্ষণের নামে সিণ্ডকেট রিপোর্ট তৈরী করেন যা মূলতঃ কালক্ষোপন। বিদেশ যাত্রার সুযোগ, বাজার করার সুযোগ ও আর্থিক সুযোগ না থাকলে হয়ত অনেকে এই ধরনের প্রশিক্ষণে আসতেন না। তাই আমি মনে করি বিপিএটিসি/আরপিএটিসি শুধুমাত্র সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকুরীতে প্রবেশ করার পূর্বে বুনিয়াদী পর্যায়েই সীমাবদ্ধ রাখলে প্রশিক্ষণ অধিক অর্থবহ হতে পারে। তাছাড়া নবীন প্রশিক্ষণার্থীদের সরকারী কর্মে যোগ্য করে তোলার জন্য প্রশিক্ষণই প্রয়োজন। ১০/১৫ বৎসর চাকুরী করার পরে তাঁদের মনমানসিকতার যে বিকাশ লাভ হয়, সিনিয়র পর্যায়ে তার পরিবর্তন অসাধ্য না হলেও দুরূহ বটে। বুনিয়াদী পর্যায়ে তাত্বিক বিষয় বস্তু ও ব্যাবহরিক দক্ষতা ও মাঠপর্যায়ে জনগণের সাথে কাজ করার জন্য নিম্নলিখিত ফর্মুলা বিবেচনা করা যেতে পারেঃ-

তাত্বিক বিষয়বস্তু ৩০%

ব্যাবহারিক দক্ষতা ৩০%

জনগণের সাথে কাজ ৩০%

প্রশিক্ষকদের মুল্যায়ন ১০%

এ ধরনের প্রশিক্ষণের জন্য ৩ থেকে ৪মাস সময় লাগতে পারে। প্রয়োজনবোধে এই সময়সীমা কমবেশী করা যায়। এই পদ্ধতির একটি বড় গুণ হলো তরুণ প্রশাসক তৈরীতে বিপিএটিসির বিশেষ ভূমিকা। আর এক বড় দুর্বলতা হোল এ ভাবে প্রশিক্ষণ চললে কোনদিনই প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশাসকদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। এ পদ্ধতিতে শুধুমাত্র প্রশাসকগণই প্রশিক্ষণ লাভ করছেন। তাঁদের সংগে জনসাধারণ প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন না।

সবার জন্য প্রশিক্ষণঃ

অতএব আমাদের এখন এমন একটি ব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে হবে যার মাধ্যমে আমরা শুধুমাত্র প্রশাসকদেরই প্রশিক্ষণ দিব না। জনগণকেও প্রশিক্ষণ দেব। কিভাবে একাজ সম্ভব? প্রশাসককে আমরা চিহ্নিত করেছি জনগণের প্রয়োজনীয় সেবক হিসাবে। আর প্রশিক্ষণকে চিহ্নিত করেছি সেই সেবা প্রদানের উদ্দোগ হিসেবে। এর আগেই বলেছি– প্রশিক্ষণ এমন একটি মুদ্রা যার একপিঠে আছেন প্রশাসকগণ অপর পিঠে আছেন জনগণ। আমরা যদি শুধু প্রশাসকদেরই প্রশিক্ষণ দেই তাহলে অপর পিঠ অর্থাৎ জনগণ পিছিয়ে যাবেন। জনগণকে প্রশাসকদের সমপর্যায়ে তুলে আনতে হবে। এটাই প্রশাসনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। কিভাবে আমরা জনগণকে প্রশাসকদের সমপর্যায়ে তুলে আনতে পারি? শিক্ষায়, সুযোগে, যোগ্যতায়, প্রশাসকগণ অগ্রসর, জনগণ অনগ্রসর। তাই এই প্রস্তাবিত সবার জন্য প্রশিক্ষণে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে প্রশাসকদেরই। তাঁদের দায়িত্ব জনগণকে প্রশিক্ষিত করে তোলা। মনে করুন, একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। জনগণের কাল্যাণেই এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তা হলে জনগণের বা তাঁদের যে কয়জন আগ্রহী ও সময় দিতে রাজি– তাঁদের ঐ প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে যথা– প্রাথমিক আলাপ–আলোচনা, পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও পরিকল্পনা মূল্যায়ন প্রভৃতি স্তরে প্রশাসকগণ জনগণের বিভিন্ন অংশকে বেছে নিয়ে কিভাবে এক সাথে কাজ করতে হয় তা শিক্ষা দেবেন, ভুল ধরিয়ে দেবেন। প্রয়োজনে হাত বাড়াবেন–তাতে জনগণ কিছুদিনের মধ্যে প্রশাসনের খুটি–নাটি যেমন পরিকল্পনাকরণ, হিসাব রক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি কাজে পাকাপোক্ত হয়ে উঠবেন। এভাবে কিছুদিন হাতে–কলমে প্রশিক্ষণ চললে জনগণই ঐ ধরণের প্রকল্প পরবর্তীতে নিজেরাই করতে পারবেন। নীতি হিসাবে প্রতি বৎসর একজন প্রশাসক যদি দশ জন জনগণকে প্রশিক্ষণ দেন, তাহলে বৎসরে ১২,২৫,৭৮৪ জন প্রশাসক ১,২২,৫৭,৮৪০ প্রশিক্ষিত জনগণ গড়ে তুলতে পারবেন। এভাবে দশ বৎসরে এগারকোটি প্রশিক্ষিত জনগণ লাভ করা যাবে।

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

শুধু প্রকল্প কর্মেই নয়, শিক্ষা বিস্তারে, গ্রাম্য শান্তি বজায় রাখতে, খাজনা আদায়ে জনগণ এবং সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে এক সংগে কাজ করতে দেওয়া উচিত। তাতে জনগণ সরকারী কর্মকাণ্ডের জ্ঞানই অর্জন করবেন না, সরকারী কর্মের বিভিন্ন অসুবিধা উপলদ্ধি করবেন যাতে তাঁদের সমালোচনা বাস্তব-ভিত্তিক হয়ে উঠবে। পক্ষান্তরে, সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ জনগণের সংগে এক সংগে কাজ করার ফলে জনগণের অভাব অভিযোগ/ দুরাবস্থার মোকাবিলা করতে পারেন। উভয়েরই রূপান্তর হবে, এভাবে গ্রাম থেকে ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারী কর্মকাণ্ডের সাথে জনগণের বিভিন্ন অংশের সরাসরি ও নিয়মিত যোগাযোগ ও এই সংগে প্রশাসন পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা অর্জিত হবে। এ জন্য প্রয়োজনীয় আইন পাশ ও সর্ব্বোচ্চ পর্যায়ে সমর্থন প্রয়োজন এবং এই প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রম/সিলেবাস জনগণের /ভুক্তভোগীদের অসুবিধা ও দূর্ভোগ থেকে চয়ন করতে হবে। অর্থাৎ জনগণের কি প্রয়োজন তা জনগণের সাথে এক সংগে কাজ করে জানতে হবে ও জনগণকে প্রশাসকের পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে।

বিপিএটিসি-র ভূমিকাঃ

যদি সরকারী সমর্থনে এ ধরণের প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ, সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং জনগণের জন্য একটি সহ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে বিপিএটিসির ভূমিকা কি হবে? শুধু একটি মাত্র কেন্দ্র বা চারটি উপকেন্দ্র থেকে এ ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব নয়। সাভার- ভিত্তিক বিপিএটিসি মূল চালিকা শক্তি, মৌলিক চিন্তা, পরিকল্পনা ও দিক নির্দেশনা দান করবে। এ কাজ ছড়িয়ে পড়বে সারা বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে, মাঠ-প্রান্তরে, অফিস-আদালতে, স্কুলে কলেজে—সর্বস্তরে। এ জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে ছাড়াও প্রতি জেলায় একটি, প্রতি উপ-জেলায় একটি, প্রতি ইউনিয়নে একটি অর্থাৎ ৩০৪৪ টি পিএটিসি বা তার শাখা গড়ে তুলতে হবে। প্রয়োজনবোধে ৬৮,০০০হাজার গ্রামে ৬৮,০০০ হাজার পিএটিসি কাজের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করবে। এর অর্থ এ নয় যে, এখনই প্রতিটি গ্রামে সুদৃশ্য ইমারত, গাড়ী, যন্ত্রপাতি দিয়ে প্রশিক্ষণের নামে প্রচুর ব্যয় সরকারের করতে হবে। না ঠিক তার উল্টো। আমার প্রস্তাবিত প্রশিক্ষণ-ইমারত, গাড়ী ও যন্ত্রপাতি ভিত্তিক নয়, আমার প্রশিক্ষণ মানুষের মনে, ব্যবহারে, চরিত্রে যা ধীরে ধীরে রূপ লাভ করে। নিয়মিত অনুশীলনে, ত্যাগে, তিতীক্ষায় সহমর্মিতায়, খোলা মাঠে অফিসার ও জনগণ এক সাথে রাত্রি জাগরণে, মাটি কাটায়, বৃক্ষরোপণে রোগীর, পরিচর্যায়, রাস্তা-কার্লভাট নির্মাণে, খাজনা আদায়ে, হিসাব নিকাশ রক্ষায়, প্রকৃতিক

দুর্যোগে বিপন্ন জনগণের সেবায়, শিক্ষার আলো বিতরণে, দুষ্টের দমনে আর শিষ্টের লালনে। এ জন্য গভীর নিষ্ঠা ও অনুশীলন যতটা প্রয়োজন, ভৌত কাঠামো ততটা নয়। প্রয়োজনে এগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে প্রধান উপজীব্য নয়, বর্জনীয় উপকরণ মাত্র। এ গুলি ছাড়াও প্রশিক্ষণ হতে পারে এবং অর্থপূর্ণ ভাবে হতে পারে। এ জন্য বিদেশী সাহায্য, বিশ্বব্যাংক, বিদেশী উপদেষ্টা ইত্যাদির প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন দেশীয় জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন কর্মক্ষম গোষ্ঠীতে চিহ্নিত করা এবং চিহ্নিত জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রশাসকদের মাধ্যমে পিএটিসির নেতৃত্ব শুরু করা এবং পরবর্তীতে দেশের সর্বত্র এই প্রশিক্ষণের দর্শন ছড়িয়ে দেওয়া। তবে এজন্য বিপিএটিসির নেতৃত্বের কিছুটা পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়বে। তেমনি প্রয়োজন হবে নতুন ধরনের পাঠ্যক্রমের (সারনী–১ দ্রষ্টব্য)।

অর্থাৎ এ ধরনের প্রশিক্ষণের খুব সামান্যই শ্রেণীকক্ষে দেওয়া সম্ভব। অধিকাংশই হাতে–কলমে কর্মস্থলে দিতে হবে। বিপিএটিসির প্রশিক্ষকগণ যে ব্যবহার, তাত্বিক দিকে শ্রেণীকক্ষে ব্যাখ্যা করবেন তার বাস্তব প্রতিফলন তাঁদেরই পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যখন তাঁদের প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা/ কর্মচারী এবং জনগণ এক সাথে সমস্যা সমাধানে মাঠে–অফিসে নিয়োজিত হতে পারেন। এভাবে কথায় ও কাজে সমন্বয় সাধনে প্রশিক্ষণ তার ভূমিকা/ অবদান রাখতে পারে।

আর একটি ভূমিকা পিএটিসি পালন করতে পারন। বিপিএটিসির গবেষণা শাখা বাংলাদেশের প্রশাসনের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করতে পারেন। এ জন্য একটি গণ–তথ্য ব্যাংক গড়ে তোলা দরকার যেখানে মাঠ পর্যায়ে বা অফিস পর্যায়ে যে কোন সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় তথ্য চাওয়া মাত্র সরবরাহ করা যায়। এ ক্ষেত্রে কম্পিউটার কাজে লাগতে পারে।

এ ভাবে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা উভয়েই উপকৃত হবে। এবং এর বাস্তব ব্যবহারে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সমৃদ্ধ হবে। এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক, এ কর্মে বিপিএটিসি, জনপ্রতিষ্ঠানসমূহ, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, পরিকল্পনা কমিশন, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহের সংগে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে একটি গবেষণা সেল সার্বক্ষণিকভাবে উন্মুক্ত রাখতে পারেন। বিপিএটিসির গবেষকগণ তাঁদের গবেষণা লব্ধ সামগ্রী কাগজের পৃষ্ঠায় বন্দী না রেখে জনগণের কষ্ট দূরীকরণের কাজে নিয়োজিত করতে পারেন। গবেষণার বিষয়বস্তু জনগণের অভিজ্ঞতালব্ধ নিত্যনৈমিত্তিক অসুবিধা ও বিড়ম্বনা প্রসূত হতে হবে।

এত বড় কাজের দায়িত্ব যাঁদের উপর বর্তাবে, তাঁদের দায়িত্বশীলতা সেভাবেই বড় হতে হবে। বর্তমানে বিপিএটিসির কাজ দেখাশুনা করার জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের বোর্ড

অব গভর্ণরস আছেন। তাঁদের সংখ্যা ১২। এখানে একজন মন্ত্রী ছাড়া বাদবাকী অধিকাংশই সরকারী কর্মকর্তা। জনগণ বা তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং সাধারণ জনসাধারণ (মাঠ, গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে) অনুপস্থিত। সরকারের কি কর্তব্য, জনগণের কি চাহিদা ও কিভাবে সে চাহিদার মোকাবিলা সম্ভব এজন্য প্রয়োজন আরও সাধারণ ভিত্তিক জনপ্রতিনিধি/ উপদেষ্টা পরিষদ গঠন। জনগণ কি চান সে কথাটি বলার লোক বেশ কয়েকজন থাকা চাই। তাহলে বিপিএটিসির জনসচেতনতা আরও বাড়বে।

আমাদের সরকার বিশেষ করে মহামান্য প্রেসিডেন্ট একটা কথা প্রায়ই বলেন, ঔপনিবেশিক আমলের শাসন ব্যবস্থা দিয়ে স্বাধীন দেশের প্রশাসন চলতে পারে না। খুব দামী কথা। কিন্তু কার্যতঃ ঔপনিবেশিক আমলের কাঠামোই বজায় আছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশাসকদের মনমানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। প্রশাসনকে জনগণের দোর গোড়ায় নিতে হবে ইত্যাদি। এ সব মহৎ বাক্যগুলিকে যদি বাস্তবে রূপান্তর করতে হয় তবে সবার জন্য প্রশিক্ষণ একটি ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। কারণ এই প্রস্তাবিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় প্রশাসনকে জনগণের কাজ হিসাবেই চিহ্নিত করা হয়েছে। এবং জনগণের কাজে জনগণ ও প্রশাসক যারা প্রশাসনের দুপিঠ তাঁরা এক সাথে মিলেমিশে কাজ করে ভাল মন্দে দায়দায়িত্ব গ্রহণ করবে, একে অপরকে গালমন্দ করবে না। প্রশাসনকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার নামই ঔপনিবেশিকতা। আর জনগণকে প্রশাসক রূপে গড়ে তোলাই স্বাধীনতা। স্বাধীন দেশের নাগরিক স্ব-শাসিত। বাইরে থেকে কেউএসে তাঁর ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না, অন্যের উপর নির্ভরশীলতা অতিক্রম করেই জনগণ প্রশাসকরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন। এই দর্শনের বিকাশ পথে বিপিএটিসি প্রশাসনকে এবং প্রশিক্ষণকে নতুন আংগিক দান করতে পারেন। তাহলেই প্রশাসন, প্রশিক্ষণ ও জনগণ- এই তিন মুর্ছনা একই সুরে বেজে উঠবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ

"সবার জন্য প্রশিক্ষণ"—প্রশাসক, প্রশিক্ষক", প্রশাসন, অর্থ-প্রশাসক ও জনগণের এক সাথে কাজের ধারণা সমূহ -এ ধরনের চিন্তার মৌলিকত্ব কোন একক ব্যক্তির নয়। বিভিন্ন মনীষীর চিন্তা, কার্য ও অভিজ্ঞতায় এ ধরনের প্রচেষ্টা বিধৃত। নানাভাবে বিভিন্ন সময়ে এ ধরনের চিন্তা আমাকে আকৃষ্ট করেছে। যেগুলি সাজিয়ে বক্ষমান প্রবন্ধে উপস্থাপিত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য সুধীজনের সমালোচনায় এ ধরনের চিন্তা আরও ব্যাপ্তি লাভ করবে। এর ক্রটি বিচ্যুতি বিদুরিত হবে এবং ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধে অভিজ্ঞজনের পরামর্শ পাওয়া যাবে বলে আশা রাখি।

সারণী ঃ ১

প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রমঃ "সবার জন্য প্রশিক্ষণ"ঃ এক বৎসর সময়ের মধ্যে।

১। অবশ্য পাঠ্যঃ মাত্র তিনটি বিষয়ঃ (বুনিয়াদী মডিউল)	২। জরুরী পাঠ্যঃ বিশেষ ধরনের দক্ষতা অর্জন (হিকমতী মডিউল) যে কোন একটিঃ সময় ছয় মাস।	৩। অল্প জরুরী পাঠ্য/ইচ্ছাধীন পাঠ্যঃ যে কোন দুইটি (তেজারতী মডিউল), প্রশিক্ষণ সময় তিন মাস।
ক) পড়তে পারা	ক) টাইপিং	ক) বাংলাদেশের রাজনীতি ও প্রশাসন
খ) লিখতে পারা	খ) ষ্টেনগ্রাফী/সর্টহ্যাণ্ড	খ) বাংলাদেশ সরকারের কাঠামোঃ জাতীয়, আঞ্চলিক, ও স্থানীয়
গ) অংক কষা (মোটামুটি ভাবে)	গ) টেলেক্স/ফ্যাক্স	গ) প্রশাসনিক দায়–দায়িত্ব ও জবাবদিহি
প্রশিক্ষণ কাল তিন মাস	ঘ) হিসাব–নিকাশ রক্ষণ	ঘ) প্রশাসনিক সমন্বয়
	ঙ) পরিকল্পনা প্রণয়ন/বাজেট প্রনয়ণ	ঙ) সরকারী প্রশাসনিক পদ্ধতি/ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
	চ) প্রতিবেদন প্রণয়ন	চ) নিজ পর্যায়ে নিজ এলাকায় প্রধান প্রধান সমস্যা চিহ্নিত করণ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ
	ছ) সমবায় কর্মকাণ্ড	ছ) স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহ ও ব্যবহার
	জ) সভা ডাকা, সভা পরিচালনা করা	জ) ছোটখাট গবেষণা, তথ্য ব্যবহার ও প্রকল্প মূল্যায়ন
	ঝ) সভার সিদ্ধান্ত লিখন	ঝ) প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণ, বাস্তবায়ন
	ঞ) কম্পাউণ্ডারী (কেমিষ্ট ও ড্রাগিষ্ট)	ঞ) প্রি–অডিট, পোষ্ট–অডিট
	ট) গাড়ী চালান, গাড়ী মেরামত ও রক্ষণা বেক্ষণ	ট) কম্পিউটার ব্যবহার
	ঠ) গবাদি পশু, হাসমুরগী ও মৎস চাষ	ঠ) বহিবিশ্ব
	ড) খেলাধুলা	
	ঢ) প্রতিবেশ পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য বিধি	

বিঃ দ্রঃ প্রশাসক প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন হাতে কলমে, কথায় ও কাজে, অফিস ও অফিসের বাইরে— যাতে অশিক্ষিত মানুষও এক বৎসরের মধ্যে একজন মোটামুটি শিক্ষিত/প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও দক্ষতা সম্পন্ন নাগরিক রূপান্তরিত হতে পারে। এভাবে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রশাসন এক অভিন্ন স্বত্তায় বিকশিত হবে যেখানে সাধারণ মানুষও প্রশাসন এই দুই এর মধ্যে ব্যবধান কমে আসে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ এ ধরনের প্রশিক্ষণের ফলে একজন প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবেন। এ ধরনের প্রশিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধানের ইংগিত স্পষ্ট।

এই মানস-মণ্ডল রচনায় নিম্নলিখিত ব্যক্তি/বক্তব্য আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেনঃ

1. " The president as National pedagouc " article in the Public Administration Review, 1947.

2. Mao ze Dong "Walking on Two Legs " Chinese communes and Cultural Revloution writings, John Gurley, " Rural Development in China 1949-72 and the Lessons to be learned from it " World Development 3: 788, 1975, 455-471.

3. Saemul Undong Movement (New community Movement) South Korea (1970)

4. Dag Hammarskjold; Another Development: Approaches and Strategies. Marc Nerfin, ed, Uppsala, Sweden. Dag Hammarskjold Foundation, 1987.

5. Another Sweden (Development Dialogue 1975: 1d:2)

6. Self-reliance and Ujamma: Tanzania's Development Strategy;

7. William Hintom, Fan-shon, n: d:a.

8. Irving Louis Horowitz, Three Worlds of Development: The Theory and practice of International tratification, second Edition, N:Y: OUP, 1972. Horowitz dedicated his book to Bangladesh with the following words:

   " To the people of Bangladesh;
   May they learn from the past,
   Live in the present, and
   Instruct the future. "

9. professor Jose Abueva, President, University of the Philippines (1987) is the source of this quote:

"The Future is not a place we are going to but a
place we are going to
But a Place we are making,
Not a path to be found
But made
And the activity changes both
The maker and the destination."

10. Akhtar Hameed khan, The Complete Works of Akhter Hameed Khan, ed. by M. Ghulam Satter (Comilla: BARD, 1985)

11. Sheikh Maqsood Ali, " the Batasam Durgapur Format for Rural Development in Bangladesh, "NIPA,1976.

12. Sheikh Maqsood Ali, " The Own Village Development (OVD) Model of Rural Development," NIPA1980.

13. Muhammad Yaseen, " The story of Deedar Cooperatives." Comilla, 1989.

14. Paulo freire, The Pedagogy of the Oppressed (NY: seabury, 1970)

15. Paulo freire, Education for critical consciousness (NY: seabury Press ,1973

16. Norman Uphoff, Feasibility and Application of Rural Development participation (Ithaca, NY: cornell University Rural development Committee, 1979).

17. Coralie Bryant and Louis White, Managing Deveopment in the Third World (Boulder; co, Westview press, 1982).